নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ (পৃ: ০৫)

ধান চাষ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের চেয়ে শোষণ করে বেশি

ড. মোঃ শাহজাহান কবীর

কয়েকদিন আগে দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমে বাংলাদেশের আকাশে মিথেনের স্তর দেখা গেছে বলে খবর প্রকাশ করা হয়েছে। বিদেশী পত্রিকা এটিকে রহস্যময় স্তর (Mysterious Plume) বলে আখ্যা দিয়েছে। সেখানে দেশী একটি পত্রিকা একধাপ এগিয়ে এটিকে মিথেনের বিশাল স্তর (Huge Plume) হিসেবে প্রচার করেছে। যা পড়ে একদিকে হতবাক হয়েছি এবং অন্যদিকে হয়েছি আতঙ্কিত। কারণ, এই মিথেন গ্যাস নিঃসরণের জন্য কৃষি তথা ধান উৎপাদনকে দায়ী করা হয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কারণটি এখানেই। কারণ, যখন বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে যাচ্ছে এবং চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে উদ্বৃত্ত হয়েছে, তখন এ ধরনের বিশ্লেষণহীন অবৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বৈ কিছু নয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) পক্ষ থেকে এর প্রকৃত ব্যাখ্যা পাঠকের কাছে তুলে ধরা দরকার বলে মনে করি। কেননা, ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সাফল্য দেশে ও দেশের বাইরে অনেকের মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে, বিশেষ করে যারা এদেশকে ব্যর্থ এবং আজীবন পরনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়।

এই ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা এই প্রথম নয়। আমরা যখন খাদ্য তথা চাল উৎপাদনে ২০১৩ সালে উদ্বৃত্ত হলাম এবং শ্রীলঙ্কায় চাল রফতানির পদক্ষেপ নেয়া হলো ঠিক তখনই বাংলাদেশের চালে আর্সেনিক আছে বলে বেশ কিছু পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। ব্রি থেকে তথ্যসহ প্রতিবাদ দেয়ায় তারা হালে পানি পায়নি। তাই বলে তারা থেমে থাকেনি। পরবর্তীতে খবর প্রকাশিত হলো ভাত খেলে ডায়াবেটিস হয়, মানুষ মোটা হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই বলে যখন আমরা ব্রি থেকে প্রতিবাদ করেছি এবং গবেষণা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যে ভাত খেলে ডায়াবেটিস এবং মোটা তো হয়ই না, বরং যেসব দেশ ভাত খায় সেসব দেশে মোটা বা ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা অন্যান্য দেশের চেয়ে কম। আমরা প্রমাণ স্বরূপ দেখিয়েছি যে, প্রতি ১০০ গ্রাম চালে ফ্রি-সুগারের পরিমাণ থাকে মাত্র ১০০ মিলিগ্রাম, যেখানে গমে ৩০০ মিলিগ্রাম, ভুট্টায় ৬০০ মিলিগ্রাম, আলুতে ৮০০ মিলিগ্রাম, গাজরে ৪৭০০ মিলিগ্রাম এবং অন্যান্য খাবারে ভাতের চেয়ে অনেকগুণ বেশি থাকে (ইউএসডিএ এর পুষ্টি ডেটাবেজ)। অতএব এখন যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েই প্রমাণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ, যে হীন উদ্দেশ্যে এই খবর প্রকাশ করা হয়েছে, তা যেন বাস্তবায়িত না হতে পারে এবং দেশের মানুষ যাতে আসল সত্যটি জানতে পারে।

সত্যটি হলো, বাংলাদেশের প্রায় ৮০-৮৫ ভাগ জমিতে ধান চাষ করা হয়। এ সমস্ত জমি থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস–মিথেন (CH_4), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), ও নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) যেমন নিঃসরিত হয়, তেমনি ধান গাছ তার শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কার্বনডাই-অক্সাইড ফর্মে এসব গ্যাস শোষণও (absorb) করছে। কিন্তু প্রচারণার সময় শুধু নিঃসরণের তথ্যটি খুব কৌশলে তুলে ধরা হয়। অথচ নিঃসরণের চেয়ে যে বেশি পরিমাণ শোষণ করা হয়, তা উল্লেখ না করে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করা হয়। আজকের আলোচনা এই নিঃসরণ ও শোষণের হিসাব নিয়ে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ২০১৩ সাল থেকে এ নিয়ে গবেষণা করে আসছে। সেখানে তারা দেখেছে ১ কেজি ধান উৎপাদন করতে ৬৬৬ গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড, ৫৩ গ্রাম মিথেন এবং ০.৫ গ্রাম নাইট্রাস অক্সাইড ধান ক্ষেত থেকে নিঃসরিত হয়। অন্যদিকে এক কেজি ধান উৎপাদন করতে ধান গাছ ২২০০ গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড ফটোসিনথেটিক প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে। এছাড়া মিথেন বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ও হাইড্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়, যা ধান ও অন্যান্য গাছ সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে। একইভাবে নাইট্রাস অক্সাইড বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এ্যামোনিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে এবং এই এ্যামোনিয়াম বায়ুমন্ডলের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে আসে, যা গাছ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রেও ধান গাছের এ্যারেনকাইমা (Aerenchyma) চ্যানেল দিয়ে বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন ধান গাছের শিকড়ের মাধ্যমে মাটিতে আসে, যা মিথেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মিথানোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কার্বন-ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে, যা গাছ গ্রহণ করে এবং এই প্রক্রিয়া বায়ুমন্ডলে মিথেন নিঃসরণে বাধা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ধান চাষাবাদে ধান গাছ মাত্র ৫-১০% মিথেন উৎপাদনে ভূমিকা রাখে বাকি ৯০-৯৫% মিথেন মাটি থেকে আসে। জলাবদ্ধ জমিতে লেবাইল জৈব কার্বন (Labile organic carbon) এবং মিথানোজেনিক ব্যাক্টেরিয়া মিথেন উৎপন্ন করে। অতএব দেখা যায়, ধান চাষের চেয়ে পতিত জমি মিথেন নিঃসরণের জন্য বেশি দায়ী।

বাংলাদেশে আউশ, আমন ও বোরো এই তিন মৌসুম মিলিয়ে পাঁচ কোটি টনের অধিক ধান উৎপাদন হয়। সে হিসাবে মোট পাঁচ কোটি টন ধান উৎপাদনে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ৩৩.৩ মিলিয়ন টন, মিথেন ২.৬৫ মিলিয়ন টন এবং নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ ০.০২৫ মিলিয়ন টন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল ফর্মুলা অনুযায়ী এই তিনটি গ্রিনহাউস গ্যাসের কার্বন ডাই অক্সাইড সমতুল্য নিঃসরণের পরিমাণ ১০৬.২ মিলিয়ন টন। অপরদিকে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে ধানগাছ ২২০০ গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। অতএব মোট পাঁচ কোটি টন ধান উৎপাদনে প্রায় ১১০ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডল থেকে শোষিত হয়। উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী ধান আবাদ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের তুলনায় ৩.৮ (১১০.০-১০৬.২) মিলিয়ন টন বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমন্ডল থেকে শোষণ করে। ফলশ্রুতিতে ধান চাষ বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের চেয়ে অনেক বেশি শোষণ করে বরং বায়ুমন্ডলকে পরিচ্ছন্ন করছে।

স্যাটেলাইট ইমেজে বাংলাদেশের বায়ুমন্ডলে যে মিথেন গ্যাসের ধোঁয়া শনাক্ত করেছে বলে দাবি করেছে জিএইচজিস্যাট এবং কায়রোস তার উৎস সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত না হওয়ায় বিষয়টিকে 'রহস্যময়' বলে উল্লেখ করেছে। এর উদ্ভব বাংলাদেশ থেকেই হয়েছে কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। মিথেনের সম্ভাব্য উৎস বাংলাদেশ বলা হলেও উৎসগুলোর পরিমাণ ও ব্যাপ্তি বাংলাদেশের তুলনায় সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে অনেকগুণ বেশি। সুতরাং মিথেন গ্যাসের ধোঁয়া যে কোন জায়গা থেকে দেশে আসতে পারে।

এক্ষেত্রে কমবেশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সমস্ত দেশে ধান চাষ, জলাভূমি ভরাট, কয়লার মজুদ ও বিদ্যুত কেন্দ্র জাতীয় কার্যক্রম রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– চীন ও ভারতসহ আঞ্চলিক দেশগুলো আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ধান চাষ করে। বাংলাদেশে যেখানে একটি কয়লা খনি আছে, সেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রায় ১০০০ এবং চীনে প্রায় ২৫০০ কয়লা খনি আছে, যেগুলোকে মিথেনের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতকেন্দ্র ও দেশগুলোতে মিথেন নিঃসরণ বেশি। সুতরাং প্রতিবেদনটিতে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের যথেষ্ট ঘাটতি আছে এবং সামগ্রিকভাবে এটি গ্রহণযোগ্য প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচিত নয়। জলবায়ু বিজ্ঞানীদের মতে, এই মিথেনের উৎস সম্পর্কে জানতে কার্বন আইসোটোপ বিশ্লেষণ জরুরী। সেটি না করে একটি দেশের বায়ুমন্ডল নিয়ে এমন নেতিবাচক প্রচারণা জনমনে আতঙ্ক তৈরি করতে পারে।

যেখানে দেশে এক বছরের ওপর করোনা পরিস্থিতির জন্য শিল্পকারখানা প্রায় বন্ধ, শুধু কৃষিই একমাত্র স্বাভাবিক গতিতে চলমান রেখে খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা হচ্ছে, সেখানে এ ধরনের প্রচারণা প্রকারান্তরে কৃষিকেই পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী বলে কৃষিতে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরির প্রচেষ্টা চলছে।

এই ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা এই প্রথম নয়। আমরা যখন খাদ্য তথা চাল উৎপাদনে ২০১৩ সালে উদ্বৃত্ত হলাম এবং শ্রীলঙ্কায় চাল রফতানির পদক্ষেপ নেয়া হলো ঠিক তখনই বাংলাদেশের চালে আর্সেনিক আছে বলে বেশ কিছু পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। ব্রি থেকে তথ্যসহ প্রতিবাদ দেয়ায় তারা হালে পানি পায়নি। তাই বলে তারা থেমে থাকেনি। পরবর্তীতে খবর প্রকাশিত হলো ভাত খেলে ডায়াবেটিস হয়, মানুষ মোটা হয়ে যায়

বাস্তবতা হচ্ছে, গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলো সবসময় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দোষারোপ করার চেষ্টা করে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

যে বিষয়টির প্রতি আমাদের সবচেয়ে জোর দেয়া প্রয়োজন তা হলো সবকিছু ঠিক রেখে কিভাবে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমানো যায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে এবং তা বাস্তবায়নে বেশকিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। যেমন- ব্রি এমন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাজ করছে যা বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে। অধিক CO_2 শোষণকারী জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ব্রি জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত জার্মপ্লাজম থেকে পরীক্ষণের মাধ্যমে এমন জাত শনাক্ত করেছে, যাদের CO_2 এর প্রতি Responsiveness বেশি এবং অধিক উৎপাদনক্ষম। ভবিষ্যতে অধিক CO_2 শোষণকারী এবং অধিক উৎপাদনক্ষম জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এ জার্মপ্লাজমগুলো ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়া ধানচাষ থেকে আরও কম গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানোর পদ্ধতি ব্যবহার, পরিমিত ও ব্যালেন্স সার ব্যবহার, ইউরিয়া সার ছিটিয়ে ব্যবহারের পরিবর্তে মাটির গভীরে প্রয়োগ (Deep placement) এবং Good Agriculture Practices (GAP) ব্যবহারের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

আমরা এখন ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) দ্বারপ্রান্তে এবং বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ আশাতীত কমে যাবে বলে আমরা মনে করি। কেননা, এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রিসিশন এগ্রিকালচার প্রাক্টিস নিশ্চিত হবে। জেনোম এডিটিংয়ের মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণকারী কাঙ্ক্ষিত জাত উদ্ভাবন এবং ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমেও নিঃসরণ কমানো যাবে। Artificial Intelligence ব্যবহারের মাধ্যমে Artificial rainfall ঘটানো সম্ভব হবে, De-Salinization প্রক্রিয়া সহজতর হবে এবং Solar energy এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আশাহত না হয়ে আশান্বিত হয়ে ভাল কিছুর প্রত্যাশা করাই শ্রেয়।

লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট